M.A, 4th sem, spl. paper — কথাসাহিত্য

সৈনিক : সামন্ততন্ত্র বনাম ধনতন্ত্র

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সৈনিক' গল্পটি তাঁর 'রেকর্ড', 'টোপ', বা 'হাড়'-এর মত জনপ্রিয় বা বহুলপ্রচলিত গল্প নয়। কিন্তু, স্বল্পপরিচিত ও গল্পটি আমাদেরকে ভাবায়। কিছু গভীর কথা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এ গল্পে বলে গেছেন।

গল্পটিতে নাটকীয়তা আছে। আছে ঘটনার ঘনঘটা। ক্লাইম্যাক্স ঘটেছে গল্পের সমাপ্তি অংশে। প্লট সংহত ও একমুখী। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গল্পটি আমাদেরকে টেনে রাখে।

'সৈনিক' গল্পটি দেবীকোট রাজবংশের দুই পুরুষের কাহিনী। এ গল্পের প্রধান অবলম্বন বা কেন্দ্রীয় চরিত্র কিন্তু কোন মানুষ নয়, 'নীলবাহাদুর' নামের একটি হাতি। 'নীলবাহাদুরই এ গল্পের রসকেন্দ্র। আর, গুরত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল একটি টিলা, যার অপর নাম পালগ্রাম। ঐ টিলা গল্পের শুরুতে ছিল নিতান্তই অনাদৃত, তুচ্ছ। পরবর্তীকালে ঐ টিলাটিই জমিদার ইন্দ্র চৌধুরীর চোখে হ'য়ে উঠল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাহিনীর শুরুতে জঙ্গলে ভরা এ টিলাতে এসে একদিন সাঁওতালরা তাদের বসতি স্থাপন করেছিল। জমিদার চন্দ্র চৌধুরীর স্নেহচ্ছায়াতলে তাদের দিন কাটছিল। নীলবাহাদুর হ'ল চন্দ্র চৌধুরীর বাহন। চন্দ্র চৌধুরীর মত হাতিটির সঙ্গেও সাঁওতালদের মধুর সম্পর্কে গড়ে উঠল। তারপর চন্দ্র চৌধুরীর মৃত্যুর পর গ্রামের নতুন জমিদার হলেন ইন্দ্র চৌধুরী। তিনি ইতিহাসে এম. এ। ঐ টিলাটি খুঁড়ে তিনি ইতিহাসের নতুন উপাদান আবিষ্কারের নেশায় মেতে উঠলেন। এভাবে তিনি অমর হতে চাইলেন। তাঁর বাহন বেবি অস্টিন নামক মোটগাড়ি। নীলবাহাদুর তার চোখে অস্থি-মাংসের অপব্যবহার। তাকে তিনি ঘৃণা করেন। টিলা থেকে সাঁওতালদেরকে উচ্ছেদ করার কাজে নীলবাহাদুরকে সৈনিক হিসাবে ব্যবহার করতে চাইলেন তিনি। অর্থাৎ সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। এ তার শুধু জ্ঞানজগতের দাবী নয়। নিজের শক্তিকে তিনি যাচাই করতে চাইলেন। তিনদিন না খেতে দিয়ে নীলবাহাদুরকে তিনি সাঁওতালদের পাকা ধানের ক্ষেতে ছেড়ে দিলেন। সাঁওতালদের বিষাক্ত তীরে নীলবাহাদুর মারা গেল। মারা যাবার সময় সে ঐ বেবি অস্টিন গাড়িটিকেও শেষ করে দিয়ে গেল। নাটকীয় এই গল্পের ঘটনাপ্রবাহ একমুখী।

এ গল্পে সৈনিক কে? আমরা লক্ষ্য করি, এ গল্পে সৈনিক শব্দের ব্যবহার হয়েছে নানাভাবে।

১। সাঁওতালদের গ্রামে গিয়ে চন্দ্র চৌধুরী বলেছেন, "বাঘ আর ডাকাতের ভয়ে আগে তো এখান দিয়ে মানুষ চলতে পারত না। তোরা হচ্ছিস আমার নিজের লোক, আমার জঙ্গী-পলটন"।

এখানে 'সৈনিক' না বলে 'পলটন' বলা হয়েছে সাঁওতালদের।

২। আমরা লক্ষ্য করি, ইন্দ্র চৌধুরী অভুক্ত নীলবাহাদুরকে তার সৈনিক হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। টিলা থেকে সাঁওতাল উচ্ছেদের কাজে নীলবাহাদুরকে তিনি সুকৌশলে ব্যবহার করলেন সৈনিক হিসাবে। প্রশাসন যেমন তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সৈনিককে ব্যবহার করে, জমিদার ইন্দ্র চৌধুরীও তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নীলবাহাদুরকে সৈনিক হিসাবে ব্যবহার করেছেন। সাঁওতালরা ছিল নীলবাহাদুরের অকৃত্রিম বন্ধু। ঐ অরণ্যের মানুষের সঙ্গে এই অরণ্যের পশুটির ছিল ভালোবাসার সম্পর্ক। তাদের মনের সুর একতারে বাঁধা ছিল। সাঁওতালদের মাদলের শব্দে নীলবাহাদুর তাই অকৃত্রিম আনন্দে নাচত। কিন্তু, ইন্দ্র চৌধুরীর কৌশলের কাছে সে সম্পর্ক চুরমার হ'য়ে গেল। তিনদিন খেতে না দিয়ে তিনি নীলবাহাদুরের মধ্যের ঘুমন্ত হিংস্র পশুটিকে জাগিয়ে তুললেন। তারপর তাকে ছেড়ে দিলেন সাঁওতালদের পাকা ফসলের মাঠে। জগদীশ ভট্টাচার্যের ভাষায়, "বুভুক্ষার অন্ধকার তাড়নায় আজ সে অত্যাচারীর হাতে হিংস্র সৈনিক মাত্র।"

সাঁওতালদের বিষাক্ত তীরে নীলবাহাদুর প্রাণ হারালো। কিন্তু, প্রাণহারানোর আগে এই সৈনিক কিন্তু প্রশাসন অর্থাৎ ইন্দ্র চৌধুরীর বিপক্ষে কাজ করল। "সে নতুন যুগের যন্ত্রবাহনকে নিজের বিরাট দেহের চাপে পাখির নীড়ের মতই ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেল।" এ গল্পের প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে নীলবাহাদুর। "কিন্তু নতুন যুগের প্রজা ও জমিদারের দ্বন্দ্বে সৈনিক হিসাবে সে শুধু প্রাণই দিল না, এ দ্বন্দ্বের স্বরূপটিও উদঘাটিত করে দিয়ে গেল।"

৩। গল্পের শেষ দিকে দেখি, "সমস্ত সাঁওতাল পাড়াকে মুখর করে নাগড়া বাজাতে লাগল। পালগ্রামের টিলার ওপর সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে নতুন যুগের সৈনিকের দল। হাতে তাদের উদ্যত তীর আর ধনুক। সংশপ্তকের অস্ত্রের লক্ষ্য আজ বদলে গিয়েছে।" এখানে 'সৈনিক'দল' শব্দটি লেখক সাঁওতালদের সম্পর্কে প্রয়োগ করেছেন। যদিও, গল্পের নামকরণের 'সৈনিক' শব্দটি নীলবাহাদুরকে লক্ষ্য করেই করা হ'য়েছে। নীলবাহাদুরই এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বা প্রাণকেন্দ্র।

এ গল্প তো সেই চিরন্তন গল্প। 'রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।'

প্রজাকে উচ্ছেদ করে রাজা আপন খেয়ালে ইতিহাসের নতুন তথ্য আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। ইতিহাসের পাতায় অমরত্ব চেয়েছেন।

পশু নিয়ে গল্প বাংলা সাহিত্য নতুন নয়। কিন্তু মহেশ (শরৎচন্দ্র), কালাপাহাড় (তারাশঙ্কর), নারী ও নাগিনী (তারাশঙ্কর), আদরিণী (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়), বাঘিনী (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়), সাদা ঘোড়া (রমেশ সেন) ইত্যাদি নানা গল্প আমরা পড়েছি। বালজাকের বিখ্যাত 'Passion in the Desert'-ও আমরা পড়েছি। এ গল্পের ঘটনাগুলিকে অনেকটাই নীলবাহাদুরের চোখ দিয়ে দেখানো হয়েছে। নীলবাহাদুর চন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে গভীর সম্পর্কে আবদ্ধ হলেও, অরণ্যের একপাল সাঁওতালের সঙ্গে তার মনের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। জগদীশ ভট্টাচার্য বলেন, "সৈনিক' গল্পের নীলবাহাদুর ব্যক্তি সম্পর্ককে অতিক্রম করে জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।"

নীলবাহাদুরের অনুভূতি এ গল্পে নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে। তার যৌবন, তার বার্ধক্য লেখকের কলামের মুন্সিয়ানায় নিপুণ ভঙ্গিতে উঠে এসেছে। একদা সে আকাশ-ছোঁয়া সরল গাছগুলোকে দেশলাইয়ের কাঠির মতো অনায়াসে ভাঙতো, "ভরা বর্ষায় সানন্দে অবগাহন করত তরঙ্গমাতাল ব্রহ্মপুত্রের জলে। বসন্তে তার মদস্রাবের গন্ধে পাহাড়ে পাহাড়ে চঞ্চল হয়ে উঠত স্বেচ্ছাচারিণী হস্তিনীর দল।"

আবার, সাঁওতালদের মাদলের ধ্বনি নীলবাহাদুরকে যেন জন্মন্তরে নিয়ে যায়। তার মনে পড়ে, 'বানের জলে বড় বড় গাছ ভেসে চলেছে, পাথরের চাঙ্গাড় নামছে হুড় হুড় শব্দে; নদীর বুকের ওপর অনেকটা জুড়ে ফেনিল জলের বাষ্পকুয়াশা...."

নীলবাহাদুরকে ঘিরে ঘিরে সাঁওতালরা যখন নাচে, তখন, আভিজাত্যের অনুভূতিতে নীলবাহাদুরের মন ভরে ওঠে। সে অনুভব করে, "শুধু ডাঙস্ খেয়ে দিন কাটানোই তার শেষ কথা নয়, সে গজেন্দ্র যুথপতি।। আর, অরণ্যের প্রতিধ্বনি হয়ে অরণ্য-মানুষ এই লোকালয়েও বয়ে এনেছে তার যথাযোগ্য সম্বর্ধনা।" আবার, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে আসে তন্দ্রাবিলতা।

তবু নীলবাহাদুরের গলার ঘন্টাধ্বনি বহন করে চলে বহু যুগের রাজশাসনের ইতিবৃত্ত। "ঠন্ ঠন্ ঠন্।"

নীলবাহাদুরের ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়ার কথাও বর্ণনা করেছেন লেখক। তার জায়গা নিয়েছে বেবি অস্টিন। কৌতুক ও কৌতূহলের সঙ্গে নীলবাহাদুর যানটাকে দেখে, তার প্রকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টা করে, তার পেট্রোলের গন্ধ নাকের

মধ্যে টেনে নেয়। অপ্রয়োজনীয় হলেও হঠাৎ আমাদের মনে পড়ে যায় ত্রৈলোক্যনাথের 'চঞ্চলার গাই-গরু' গল্পের ডমরু ধরের সেই প্রশ্নটি। "মোটর গাড়ী টানিবার নিমিত্ত ঘোড়া থাকে না। তবে ইহার ভিতর কোনরূপ বিলাতি জন্তু জানোয়ার থাকে কি না, তাহা আমি জানি না।"

পিলখানায় তন্দ্রাতুর নীলবাহাদুর সন্দিহান হ'য়ে ওঠে। আজ সে পর্যাপ্ত খাদ্য ও যত্ন পায় না। পায় না সম্মান। সে বুঝতে পারে, সে অনাবশ্যক।

ইন্দ্র চৌধুরীর বেবি অস্টিনের প্রতি ঈর্ষা বোধ করে নীলবাহাদুর। "হঠাৎ একটা প্রচণ্ড জিঘাংসা যেন তার ঘুমন্ত চেতনাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সজাগ করে তোলে। কেমন করে কে জানে, সে বুঝতে পেরেছে ওই জানোয়ারটাই তার প্রতিদ্বন্দ্বী।....এক আছাড়ে ওই জানোয়ারটাকে কি ধুলো করে উড়িয়ে দেওয়া যায় না?" নীলবাহাদুর যদি সামন্ততন্ত্রের প্রতীক হয়, বেবি অস্টিন, তবে ধনতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র ধনতন্ত্রকে শত্রুরূপে দেখে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জলসাঘর' গল্পেও 'ছোটগিন্নী' নামক হস্তিনীর কথা আছে। এগল্পেও নূতন ধনী গাঙ্গুলীরা মোটর গাড়ি কিনেছে। এখানেও হাতি সামন্ততন্ত্রের প্রতীক এবং মোটর ধনতন্ত্রের প্রতীক। এ গল্পেও সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের দ্বন্দ্বের কথা আছে। এ গল্পে গ্রামের লোকের কাছে, "তাঁহাদের দামী মোটরের চেয়ে বৃদ্ধ হস্তিনীর খাতির বেশী।"

পিলখানার সামনে দাঁড়িয়ে ইন্দ্র চৌধুরীর মনে হয়, নীল বাহাদুর যেন মর্মভেদী দৃষ্টিতে তার মনের সব গোপন কথা পড়ে নিচ্ছে।

লেখক অসীম আন্তরিকতার সঙ্গে নীলবাহাদুরের অন্তিম প্রহরের ছবি এঁকেছেন।

গল্পের সমাপ্তি আমাদের মনে একটি প্রশ্ন জাগায়। লেখক কি বলতে চাইছেন? সামন্ততন্ত্র ধনতন্ত্রকে পদপিষ্ট করল। এখানে কি সামন্ততন্ত্রের হাতে ধনতন্ত্রের পরাজয় দেখালেন লেখক? লেখক কি তবে তারাশঙ্করের মত অবক্ষয়ী 'সামন্ততন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক? নাকি, এটা নিছকই একটা বাস্তব ঘটনার চিত্র অঙ্কন?

এ গল্পেও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী Naturalistic। তিনি শুধু ঘটনাটি বিবৃত করলেন। কোন মন্তব্য করলেন না। Naturalistic realism-এর স্বাক্ষরবাহী গল্পটি কিন্তু অনবদ্য। যদিও কোন কোন সমালোচক বলেন, এ গল্পে লেখকের কোন কমিটমেন্ট নেই। সোমনাথ লাহিড়ীর গল্পের মত বা সোমেন চন্দের দাঙ্গা মত হয়েছে গল্পটি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়েরই 'হাড়', 'বীতংস', বা 'টোপ' গল্পের কথা

মনে করায়। তত্ত্বসন্ধানী পণ্ডিতেরা যাই বলুন না কেন, গল্পটি যে বাস্তবসম্মত, একথা সবাই একবাক্যে, স্বীকার করবেন। গল্পটি একটি রসোত্তীর্ণ গল্প, একথাও নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এ গল্পের অপর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল, চন্দ্র চৌধুরী ও নীল বাহাদুরের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। "কিন্তু, একক চন্দ্র চৌধুরী অসম্পূর্ণ। তাঁর নামের সঙ্গে আর একটি প্রাণী জড়িয়ে আছে অচ্ছেদ্য হয়ে—সে নীলবাহাদুর। "চন্দ্র চৌধুরীকে নীলবাহাদুরের সঙ্গে বারে বারে এক করে দেখানো হয়েছে। হাতীর গলার ঘন্টার শব্দ দূর থেকে ভেসে আসতে শুনে প্রজারা বলে ওঠে, 'জমিদার এসেছে'। 'জমিদার' শব্দের সঙ্গে 'নীলবাহাদুর' নামের হাতীটি মিলেমিশে গেছে।

আবার, নীলবাহাদুরের জরা বর্ণনার পরই লেখক চন্দ্র চৌধুরীর জরা বর্ণনা করেছেন।

নীলবাহাদুরের সঙ্গে সাঁওতাল প্রজাদের সুসম্পর্ক। "ক্ষুদে চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে সে যেন একবার সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করে নিলে।" চন্দ্র চৌধুরীও সাঁওতালদের জিজ্ঞাসা করলেন, "ভালো আছিস তোরা সব?"

'আদরিণী' গল্পে জয়রাম মোক্তারের সঙ্গে আদরিণীর পিতা-পুত্রী সম্পর্ক ছিল। কিন্তু, তারা দুজন মিলে মিশে এক হয়ে যায়নি। তাদের দুজনের পারস্পরিক টানও খুব গভীর ছিল। আদরিণী মারা যাবার অল্প কিছুদিন পরেই জয়রাম মোক্তার মারা যান। কিন্তু, তাদের দুজনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল।

এ গল্পে লেখকের ভাষাভঙ্গি অনবদ্য। অপূর্ব কাব্যিক ভাষা। ভাবের উপযোগী ভাষা ব্যবহার করেছেন লেখক। কখনও ভাষায় আসে 'কালিদাসে'র 'মেঘদূতে'র-(পূর্বমেঘ) অনুষঙ্গ। যেমন—'সমস্ত দিন বপ্রক্রীড়া করেও এতটুকু স্বস্তি নেই নীল বাহাদুরের'। 'বপ্রক্রীড়া' শব্দটির অনুষঙ্গে আমাদের মনে পড়ে যায়, 'বপ্রক্রীড়া-পরিণত গজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ। আবার, কখনও বা তাঁর ভাষায় লক্ষ্য করি রবীন্দ্রপ্রভাব "ওদের নাগাড়া টিকারা ওদের রণডঙ্কা"। 'রণডঙ্কা' শব্দটি আমাদের মনে আনে 'ওরা কাজ করে' কবিতার সেই বিখ্যাত পংক্তিটি, "রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে।" আবার, 'ঝড়ের মেঘের মন্দ্র জাগে তার নির্মোঘে'—পড়ে মনে পড়ে, "মেঘের বুকে যেমন মন্ত্র জাগে/বিশ্বানাচের কেন্দ্রে যেমন ছন্দ জাগে।"

কখনও বা ভাষার লাগে রূপকথার ছোঁয়া। "ডুম ডুম ট্রুম—সাঁওতালদের নাগাড়া বেজে উঠল। বরেন্দ্রভূমির ঘুমন্ত আকাশে অনেক দিন পরে জাগরণের ছোঁয়া লেগেছে।" রূপকথার রোম্যান্টিক আবেশে গল্পের মোহময় সূচনা ঘটান লেখক। 'জাগরণের ছোঁয়া' শব্দটি মনে আনে রূপকথার ঘুমন্ত রাজকন্যার মাথায়

সোনার কাঠি ছুঁইয়ে জাগিয়ে তোলার কাহিনীকে। বরেন্দ্রভূমি যেন রাজকন্যা। ঘুমন্ত রাজকন্যার বা ঘুমন্ত বরেন্দ্রভূমির ঘুম ভাঙাবে সাঁওতালের দল। কুমারী মাটির ঘুম ভাঙবে। মাথার উপর চিলের তীক্ষ্ণ চীৎকার করে উড়ে যাওয়া, আল মাটির অসংখ্য টিলার এখানে ওখানে বিরাটকায় শঙ্খিনী সাপের পেট টেনে টেনে মন্থরগতিতে এগিয়ে চলা সমস্ত কিছু মিলিয়ে যেন এক রূপকথা। কিন্তু, রূপকথার ঢঙে সূচনা হ'লেও এটি আসলে নিতান্তই বাস্তবধর্মী এক গল্প।

দুঃসাহসিক যাযাবর বৃত্তির দৌলতে অজানা পৃথিবী সাঁওতালদের হাতের মুঠোয়। "বিমুখ প্রকৃতিকে ওদের ভয় নেই এতটুকুও। মাটির বুক থেকেই ওরা ছিনিয়ে আনতে পারে প্রতিদিনের উপকরণ।" এ অংশটি মনে করিয়ে দেয় নজরুল ইসলামের 'জীবন-বন্দনা' কবিতার সেই অংশকে—

"বন্য-শ্বাপদ-সঙ্কুল জরা-মৃত্যু-ভীষণা ধরা/যাদের শাসনে হল সুন্দর কুসুমিতা মনোহরা।" কিংবা, "শ্রম-কিণাঙ্ক-কঠিন যাদের নির্দয় মুঠিতলে/ত্রস্তা ধরণী নজরানা দেয় ডালি ভরে ফুলে ফলে।"

কখনও বা সরল ভাষায় বর্ণিত হয় সরল সাঁওতাল জাতির আদিমতাময় সরল জীবন ছন্দ। 'নাগড়া বাজিয়ে ওরা বাঘ মারে, আর যুদ্ধ করে মাদল বাজিয়ে ওরা নাচে, আর বাঁশী বাজিয়ে ওরা ভালোবাসে।"

কখনও বা কাব্যিক দ্যোতনা লাগে ভাষায়—"মজে যাওয়া দীঘিতে ওদের চোখে পড়েছে কুমীরের ছায়া। স্মরণে আসে, "যারা বর্বর, হেথা বাঁধে ঘর পরম অকুতোভয়ে/বনের ব্যাঘ্র, মরুর সিংহ, বিবরের ফণী লয়ে।"

"প্রগৈতিহাসিক যুগের কালো পাহাড়ের গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসেছে কালো গ্রানাইটের তৈরী কিরাতের দল।" অপূর্ব কাব্যিক বর্ণনা। 'কিরাত' শব্দটির ব্যবহার লক্ষণীয়।

গল্পের প্রথম অংশটি পড়তে পড়তে মনে পড়ে এই লেখকেরই 'পদসঞ্চার' উপন্যাসের বর্ণনাভঙ্গি।

চন্দ্র চৌধুরীর চেহারার যে বর্ণনা দেন লেখক তা আমাদের নজর কাড়ে। চন্দ্র চৌধুরীর চেহারার সঙ্গে বীরত্ব এবং জমিদারী বা সামন্ততন্ত্র জড়িয়ে রয়েছে। "কপালের দুপাশে শিরা দুটো অত্যন্ত স্ফীত। বাঁ-হাতে তিনটে আঙুল নেই। হিজল বনে একবার বাঘ শিকার করতে গিয়েছিলেন তিনি—বন্দুকের টোটা ফুরিয়ে যাওয়ায় বাঘের সঙ্গে কুস্তি লড়তে হয়েছিল তাঁকে। শোনা যায় আছাড় মেরেই তিনি বাঘটাকে বধ করেছিলেন—এমন শক্তিমান পুরুষ চন্দ্র চৌধুরী"। চন্দ্র চৌধুরীর মৃত্যুও জমিদারসুলভ। পাগলা ঘোড়ার পিঠ থেকে আছড়ে পরে মৃত্যু।

চন্দ্র চৌধুরীর আভিজাত্য মণ্ডিত চেহারা,—"টকটকে লাল চেহারা রক্তের চাপে সমস্ত মুখ যেন ফেটে পড়ছে। আমাদের মনে আসে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়েরই 'হাড়' গল্পে রায়বাহাদুরের চেহারা। 'ভারী গোল একখানা মুখ টকটকে ফরসা ত্বকের ভেতর দিয়ে রক্ত কণিকা বাইরে ফুটে বেরিয়ে পড়ছে। ব্লাডপ্রেশার কথাটার ডাক্তারী সংজ্ঞা জানি না, কিন্তু কথাটার বাংলা অর্থ যদি রক্তাধিক্য হয় তা হলে ভদ্রলোক নিশ্চয়ই ব্লাড-প্রেশারে ভুগছে।'

জমিদার বা রাজাদের বাঘ শিকারের কাহিনী সুবিদিত। চন্দ্র চৌধুরীর বাঘ শিকার সূত্রে মনে পড়ে 'জলসাঘর' (তারাশঙ্কর) গল্পের বিশ্বম্ভর রায়কে। "বড়দরের শিকারী বাঘ মারা ওঁর খেলা।" কিংবা জলসাঘরের দেওয়ালে টাঙানো রাবণেশ্বর রায়ের ছবি। "রাবণেশ্বর রায় দাঁড়াইয়া আছেন—শিকার করা বাঘের উপর পা রাখিয়া, হাতে সড়কি-বল্লম, পিঠে ঢাল।" 'টোপ' গল্পে রাজাবাহাদুর মানুষের বাচ্চাকে বাঘ শিকার করার জন্য টোপ হিসাবে ব্যবহার করতেন। তবে, দুজনের শুধুমাত্র বাঘ শিকারটুকু মেলে। চন্দ্র চৌধুরী অসম্ভব প্রজাবৎসল জমিদার। তুলনায়, ইন্দ্র চৌধুরীর প্রজার প্রতি মমতা অনেক কম।

গল্পের কোথাও পাই পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা। সাঁওতালরা শিকার করে বাঁশে ঝুলিয়ে নিয়ে আসছে একটি দাঁতালো শুয়োরকে। "অপরিচ্ছন্ন কালো শরীরে আট দশটা তীর শরশয্যার মত বিঁধে রয়েছে। সর্বাঙ্গে থকথকে গাঢ় রক্ত রোদের তাপে শুকিয়ে গিয়ে আলকাতরার মতো চটচট করছে।" একেবারে জীবন্ত বর্ণনা।

সাঁওতালদের মুখে তাদের ভাষাই বসিয়েছেন গল্পকার। চন্দ্র চৌধুরী "তাই বলে শুয়োর দিয়ে কী করব রে" প্রশ্নের জবাবে সাঁওতালরা বলে,—'খাবি বাবু'। চন্দ্র চৌধুরীর প্রত্যাখ্যানে ব্যথিত সাঁওতালরা বলে, "তবে তোকে আমরা কী দেব বাবু?"

তারাশঙ্করের 'কালিন্দী' উপন্যাসে সাঁওতালরা খরগোশ মেরে এনে জমিদার পুত্র অহীন্দ্রকে উপহার দিতে চেয়েছিল। "সারী বলিল—আপোনার কাছে এলম গো, আমরা আজ সব শিকার করলাম, এই আনলম দুটো সুসুরে—উই যি, তোরা কি বুলিস সেই?.....সারী বলিল, হুঁ, খরগোশ আনলম লেগে গো"। বলা বাহুল্য, অহীন্দ্রও মৃত খরগোশ দুটি নেয়নি।

জমিদার চন্দ্র চৌধুরীর সামনে এসে সাঁওতালের দল সাষ্টাঙ্গে অভিবাদন জানালো, তাঁর প্রজা হতে চায় তারা। ঠিক এইভাবে 'কালিন্দী' (তারাশঙ্কর) উপন্যাসে সাঁওতালরা জমিদার পুত্র অহীন্দ্রর কাছে এসেছিল। "আপনার কাছে

তো এলম গো। বুলছি আমাদের জমি কটির খাজনা তুরা লে, আমাদিগকে চেক-রসিদ দে, তা নইলে কি করে থাকবো গো?" (কালিন্দী) দুটি ক্ষেত্রেই আমরা একেবারে জীবন্ত বর্ণনা পাচ্ছি। চন্দ্র চৌধুরী অতি সদয় জমিদার। তিনি সাঁওতাল প্রজাদের কাছে খাজনাও নেন না। 'তোদের কাছে আবার খাজনা কিরে।"

নায়েব নৃসিংহ মুখুজ্জের ভাষায় লেগেছে সাঁওতালদের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব। "সাপ তো সাপ হুজুর, বাঘের মাংস পেলে তাও কাঁচা চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে পারে, বলে কী জানেন? বাঘ যখন আমাদের মাংস খাবে, তখন আমরাই বা বাঘকে ছেড়ে দেব কেন?" গল্পের শেষ দিকে এই নায়েবকেও কিন্তু আমরা সাঁওতালদের প্রতি মমতাময় হ'য়ে উঠতে দেখি। "সেই জীবন্ত মানুষদের তাড়িয়ে দিয়ে কঙ্কালকে পুজো করতে হবে—এ কোন দেশী খেয়াল?"

ইতিহাসের এম. এ. নব্য কালের জমিদার ইন্দ্র চৌধুরী কথা বলেন ইংরাজী ভাষা মিশিয়ে। "আনন্দ হচ্ছে এই যে, হয়তো টিলাটা এক্সক্যাভেট করিয়ে ঐতিহাসিকদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে আমার নাম।" পক্ষান্তরে, চন্দ্র চৌধুরীর ভাষায় ইংরাজী শব্দের প্রয়োগ দেখি না।

ইন্দ্র চৌধুরীর ভাষায় সাঁওতাল প্রজাদের প্রতি তার অবজ্ঞা প্রকাশিত—"খাইয়ে দে সমস্ত ধান, দলে পিষে শেষ করে দে। জমি ছাড়বে না—রামরাজত্ব পেয়েছে।"

কোথাও বা গভীর ব্যঞ্জনাবাহী পংক্তি পাই। তিনদিন খেতে পায়নি নীল বাহাদুর। একসঙ্গে তার মধ্যে জেগে উঠেছে বুভুক্ষা আর বার্ধক্য। তবু এগিয়ে চলেছে, 'লক্ষ্যহীন অন্ধ চোখে'; "আর মাঝে মাঝে মনে হতে লাগল পিছনে বহুদূরে সে সেই যান্ত্রিক জানোয়ারটার অস্ফুট গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছে—হাওয়ায় আসছে পোড়া পেট্রোলের বিচিত্র গন্ধ।" অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীতেই তো সামন্ততন্ত্রকে তাড়া করছে ধনতন্ত্র। এই রূপকের ব্যবহার আমাদেরকে চমকিত করে।

কখনও বা দেখি নীল বাহাদুর বুঝতে পেরেছে, ঐ জানোয়ারটাই তার প্রতিদ্বন্দ্বী। সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্র তো সত্যই পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। কি সহজ ভঙ্গিতে উচ্চারিত হয়েছে কি গভীর কথা! রবীন্দ্রনাথের 'ওরা কাজ করে' কবিতার বক্তব্যকে লেখক (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়) তুলে ধরেছেন তাঁর কলমের একটি লাইনে। "চন্দ্র চৌধুরীর মনে হল, বার বার মনে হল : সেদিনের পালগ্রাম আবার জেগে উঠেছে নীরবতার সঞ্জীবনীতে। অত্যাচারী রাজার একক

প্রতাপে নয়—বহু মানুষের, বহু মাটির মানুষের লৌহ কঠিন পেশীর শক্তি-মুখে।"

মনে পড়ে যায়—

"রাজছত্র ভেঙে পড়ে,
রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে,
জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে,
....
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের পরে,
ওরা কাজ করে।"

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গদ্যের শক্তিকে অস্বীকার করার সাধ্য কারও নেই।

উপমার অভিনবত্ব লক্ষ্য করবার মত। পুরানো স্লেটের মতো কালো গলার চামড়া ঝুলে পড়ছে নীচে।" কিংবা, "আদমের প্রথম পুত্রের মতো বোরোর জমি থেকে উঠে এল কর্দম মলিন আধা-উলঙ্গ পুরুষের দল।"

কোথাও বা পাই গদ্যে লেখা একটি কবিতা। "লাঙ্গলের ফলা দুমড়ে বন্ধ্যা মাটিকে উর্বরা করেছে তারা; তীরের আগায় নির্বংশ করেছে দাঁতালো শুয়োরের পাল, বল্লমের মুখে বিঁধে তুলেছে দীঘির পাড়ে ঘুমন্ত কুমীরকে।"

কাব্যিক পংক্তি প্রচুর। "মজে যাওয়া দীঘির শীতল কাদার তলায় শিলা লেখন হয়তো বিস্মৃত ইতিহাসের বন্ধ দুয়ার খুলে দিতে পারে" কিংবা "জন্মান্তর? আজ এই মাদলের ধ্বনি যেন নীল বাহাদুরকে আবার জাতিস্মর করে তুলল! কোনো ঝড়ের রাত্রে মর্মরিত অরণ্যের সুর; বানের জলে বড় বড় গাছ ভেসে চলেছে, পাথরের চাঙ্গড় নামছে হুড় হুড় শব্দে।" অনেকটা এই ধরনের ভাবনা আছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের "রেকর্ড" গল্পে।

'সৈনিক' গল্পে নীল বাহাদুরের সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে আমরাও অরণ্যের সুর শুনি, সাঁওতালদের মাদলের শব্দে তার মতই আমাদের চিত্তও আলোড়িত হয়। তার মৃত্যুতে আমরা গভীর বেদনা বোধ করি। 'সৈনিক' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এক অসামান্য সৃষ্টি, একথা আমরা একবাক্যে মেনে নিই।